সরকারের দাতাপ্রেম এবং সার্বভৌমত্ব নিয়ে দুশ্চিন্তা

শওগাত আলী সাগর

অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান কথা বলতে খুউব ভালোবাসেন। তার চেয়েও ভালোবাসেন মিডিয়ায় প্রচার পেতে। বরাবরই বেশি কথা, অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে তিনি মিডিয়ায় তার উপস্থিতি নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। অবশ্য তাঁর কোনো বক্তব্য নিয়ে দলে কিংবা সরকারে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে তিনি অবলীলায় তার সকল দায়দায়িত্ব পত্র-পত্রিকার উপর চাপিয়ে দিয়ে তাবৎ রিপোর্টারকে মিথ্যাবাদী বানিয়ে নিজে তৃপ্তির হাসি হাসতে একটুও দ্বিধা করেন না। তা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশের মিডিয়া মি. রহমানকে ভালবাসে (!) কিংবা ভালবাসতে বাধ্য হয়। প্রিন্ট মিডিয়া,বিশেষ করে টেলিভিশন চ্যানেলের প্রতিনিধিরা অর্থমন্ত্রীকে কাভারেজ দিতে তার অফিসের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকেন। সেই দিক দিয়ে জনাব রহমান বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী বই কি!

জনাব রহমানের আরো একটি প্রিয় বিষয়, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত রকমের দহরম মহরম এবং তাদের কাছ থেকে প্রশংসাসুচক সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে নিজের কৃতিত্বের প্রচারণা চালানো। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই এই দুই প্রিয়'র বিরুদ্ধেই সাইফুর রহমান অবিরাম কটু বাক্য বর্ষণ করে চলেছেন। কেবল অর্থমন্ত্রীই নন, জোটবদ্ধভাবে জোট সরকারই মিডিয়ার বিরুদ্ধে এক ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কারণ, মিডিয়া নাকি মিছেমিছিই তাদের দোষ ধরে! তাই সেই যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকরা মিথ্যাবাদী' - এই তত্ত্ব দেশে এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠা করা। দেশের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব এই দুটোই নাকি বর্তমানে বিপন্ন মিডিয়ার দেশবিরোধী ভুমিকা ও দাতাগোষ্ঠীর অযাচিত মন্তব্যের কারনে।

ফলে সংবাদপত্রের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীরাও অর্থমন্ত্রী এবং সরকারের রোষানলে পড়েছেন। বেশ কিছু দিন ধরেই অর্থমন্ত্রী দাতাদের বেশ একটু গরম দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের ভাষণে যখন দাতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে হুংকার দিয়ে বসলেন, তখন অর্থমন্ত্রীও তাঁর বরাবরের উঁচু গলা আরো এক ধাপ বাড়িয়ে দাতাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিয়ে বসলেন, মানিয়ে চলতে না পারলে চলে যান।'

কেন এই ধমক? কারণ, দাতারা সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের বেশ একটু সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিলেন। সেটি এই সরকারের পক্ষে মানা কঠিন হলেও প্রথম প্রথম তারা হজম করার চেষ্টা করেছিলেন। শুনেও না শোনার ভান করে চলছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে ওয়াশিংটনে বসে আলাদা বৈঠক করার পর সরকারের পক্ষে আর সেটি হজম করা সম্ভব হয়নি। ফলে তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন স্বভাবজাত ভঙ্গিতেই।

ঢাকার পত্রপত্রিকার তথ্য অনুসারে, প্যারিসে বিশ্বব্যাংকের অন্য একটি সভায় যোগ দিতে যাবার আগে মার্চের গোড়ার দিকে জনাব সাইফুর রহমান বলেছিলেন,আভ্যন্তরীণ বিষয়ে দাতাদের হস্ক্ষেপ দেশের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করবে। তিনি এও বলেছেন, প্যারিসে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি বিশ্বব্যাংকের প্রধানকে ওয়াশিংটন বৈঠকের ব্যাপারে নালিশ জানাবেন। বাংলাদেশকে নিয়ে ওয়াশিংটনে দাতাদের বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বাংলাদেশ যে খুশি নয় তাও তিনি তাঁকে জানাবেন।

এই সংবাদটি পাঠ করার পর থেকেই সীমাহীন কৌতুহল নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম, প্যারিসে বিশ্বব্যাংক নির্বাহীর সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর আদৌ কোনো স্বতন্ত্র বৈঠক হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে সেই বৈঠকে অর্থমন্ত্রী তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন কিভাবে এবং বিশ্বব্যাংক নির্বাহী-ই বা কি জবাব দিয়েছেন। কৌতুহলের অবশ্য কারণও আছে। এর আগে অর্থমন্ত্রী কোনো একটি সম্মেলনে জার্মানী যাওয়ার আগে ঢাকায় সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর শীর্ষ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করে তিনি বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রতিবাদ জানাবেন। জার্মানী থেকে ফিরে আসার পর তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের শীর্ষ নির্বাহীরা স্বীকার করেছন,'যে প্রক্রিয়ায় তাঁরা দুর্নীতির সুচক নির্ধারন করেন, সেটি সঠিক নয়। তারা এটি সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছেন।' অর্থমন্ত্রীর বরাত দিয়ে এই খবর প্রকাশের পর পরই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য সঠিক নয় বলে দাবি করে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিবৃতিটি মুলত অর্থমন্ত্রীকে 'মিথ্যাবাদী ' হিসেবে চিহ্নিত করলেও অর্থমন্ত্রী এর জবাবে নতুন করে কিছু বলেন নি।

প্যারিস থেকে ফেরার পর অর্থমন্ত্রী বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ঢাকার শীর্ষস্থানীয় প্রায় সবকটি পত্রিকাতেই আমি এই সংবাদটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়েছি। ওয়াশিংটন বৈঠক নিয়ে দাতাদের সঙ্গে তাঁর কোনো বৈঠক হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে কোনো পত্রিকাতেই কোনোকিছু উল্লেখ ছিলো না। তবে দৈনিক জনকণ্ঠ এই সংক্রান্ত রিপোর্টটির একেবারে শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করেছে, বিশ্বব্যাংক নির্বাহী নাকি অর্থমন্ত্রীকে বলেছেন, 'তোমরা অযথা ভুল বুঝেছ, আমরা তো তোমাদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলি নি।'

তবে প্যারিস থেকে ফিরেই দাতাদের বড় ধরনের ধমক দিয়েছেন সাইফুর রহমান। এর পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও দাতাদের খানিকটা শাসন করে বক্তব্য দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর শাসন, অর্থমন্ত্রীর ধমক এবং কোনো কোনো পশ্চিমা কুটনীতিককে দেশ থেকে প্রত্যাহারের অনুরোধ জানানোর সরকারি উদ্যোগের খবর পড়তে পড়তে আপনা আপনি মনে প্রশ্ন জাগলো, বিএনপি হঠাৎ করে উন্নয়ন সহযোগীদের প্রতি এমন ক্ষেপে উঠলো কেন? উন্নয়ন সহযোগীরা কি তা হলে সরকারকে কোনো ধরনের সিগন্যাল দিয়েছে? দাতারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, এই তথ্যটি

জানার পরই কি সরকার দাতাগোষ্ঠীর বির"দ্ধে হুংকার দিয়ে জনগনকে বুঝাতে চাইছে যে, আমরা আসলে কাউকেই পরোয়া করি না। কে জানে!

বাংলাদেশের মিডিয়ার প্রতি অর্থমন্ত্রীই কেবল নয়, সরকারেরই যথেষ্ট ক্ষোভ আছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে সরকারের নীতিনির্ধারক শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রীরা বাংলাদেশের সংবাদপত্রের বির"দ্ধে এক ধরনে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। আইনমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হ"ছে 'ফ্রিডম টু লাই'। আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো একধাপ এগিয়েছেন, 'বিদেশী পত্রিকাগুলো বাংলাদেশের বির"দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের কিছু রাজনীতিবিদদের বহির্বিশ্বে গিয়ে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা। বাংলাদেশে তালেবান, আল-কায়েদা আছে বলে বাংলাদেশের কিছু পত্রপত্রিকাও লিখছে।' (সুত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ৮ মার্চ,২০০৫)

মিডিয়ার প্রতি সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিদের আস্ফালন এবং আক্রমণাত্মক বক্তব্য-বিবৃতির কারণ ব্যাখ্যা করে অনেকেই নানারকম বিশ্লেষণ করছেন। কেউ কেউ বলছেন, মিডিয়া সরকারের কীর্তি-অপকীর্তি এমনভাবে উন্মোচন করে দি"ছ, যে দেশে বিদেশে এই দলটি, এই সরকার আর মুখ দেখাতে পারছে না। ফলে তারা নিজেরা সংশোধনের দিকে না গিয়ে মিডিয়াকে মিথ্যাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করছে। যেমন, প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী দাতাদের বির"দ্ধে কঠোর ভাষায় হুংকার দিলেও শেষমেষ দাতাদের জানিয়ে দিয়েছেন তারা যেন সংবাদপত্রের কথায় কান না দেয়। কারণ 'সংবাদপত্রে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।' ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে টমাস সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ও পরে জনকণ্ঠকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন,'সরকারের তরফ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পত্রিকায় সঠিক খবর প্রকাশিত হয় নি।' এর মানে কি? সংবাদপত্রকে মিথ্যাবাদী ঠাউরে পশ্চিমা কুটনীতিকদের বাসায় প্রাতঃরাশে আমন্ত্রন জানিয়ে পরিস্থিতির আপাত সামাল দেওয়া। এই তো!

কিন্তু এই প্রবণতাটি কেন? সরকারের রাজনৈতিক চরিত্র এবং দলটির জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে এই প্রবণতাটি সম্পর্কযুক্ত বলে মনে হয়। সরকারের রাজনৈতিক চরিত্র যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তা হলে দেখা যাবে সামরিক স্বৈরাচারের উদরে জন্ম নিলেও বিএনপি নব্বইয়ের এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে রাজপথের সংগ্রামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার জন্মের পাপ স্খলন করে গণতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করেই রাষ্ট্র ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছিলো। কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদে মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষমতায় আসার পর প্রথমে নিজেদের মৌলবাদী রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেও এখন ক্রমশঃ জঙ্গী সন্ত্রাসবাদের মদদদাতা খুনী চক্র হিসেবে চিহ্নিত হতে চলেছে। আর তাদের কর্মকান্ডই জানান দি"ছ বিএনপি আসলে তার জন্মের ইতিহাস ভুলে যায়নি।

একের পর এক বোমা হামলা, বেছে বেছে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা এবং এই সব হত্যাকান্ডকে বিরোধীদলেরই কাজ বলে অপপ্রচার চালিয়ে স্বাভাবিক বিচার প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত

করে একদিকে সরকার খুনীদের আড়াল হতে সহায়তা দিয়েছে। আর অন্যদিকে মিডিয়া এই বিষয়গুলো দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছে বলে সরকার ক্ষেপে গিয়ে মিডিয়াকে গালাগালি করছে। শেষপর্যন্ যখন উন্নয়ন সহযোগীরা এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুর" করেছে, তখনই সরকারের মনে হয়েছে এগুলো হ"ছে দাতাদের অভ্যন্রীণ বিষয়ে হস্ক্ষেপ, যা-কিনা গণতন্কে বাধাগ্রস্থ করছে।

বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর পরই উন্নয়ন সহযোগীদের প্রথম বৈঠকটি হয় প্যারিসে। সাংবাদিক হিসেবে এই বৈঠকের সংবাদ সংগ্রহ করতে আমাকে সেবার প্যারিসে যেতে হয়েছিল। সেই বৈঠকে দাতারা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেয়। অবশ্য সরকারের অন্যতম নির্বাচনী প্রতিশ্র"তি ছিলো দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন। কিন্তু বাস্বে এর বিষয়ে কদ্দুর কি অগ্রগতি হয়েছে তা বোধ হয় নতুন করে কাউকে বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।
পত্রপত্রিকার খবর থেকে জানা যায়, ওয়াশিংটন বৈঠকে ইউরোপীয় কোনো কোনো দেশ বাংলাদেশে সাহায্য বন্ধের প্রস্াব করেছিলো। বিশ্বব্যাংক এই প্রস্াবের বিপক্ষে জোরালো অবস্থান নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভুমিকাও ছিলো সরকারের প্রতি নমনীয়। উন্নয়ন সহযোগীদের সমন্বয়কারী বিশ্বব্যাংকের এই নমনীয় অবস্থানে বিস্ময় প্রকাশ করে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন বিশ্ব ব্যাংক নমনীয় হওয়ার কারন কি? আমি তাদের বলেছি, বাংলাদেশ দীর্ঘ দিন বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এর খাঁচার (!) বাইরে ছিলো। আওয়ামীলীগের শাসনামলে এই দুটি বহুজাতিক সংস্থা বাংলাদেশকে তাদের কর্মসুচীর অন্র্ভুক্ত করতে দিনের পর দিন চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু তাদের প্রস্াব, শর্তাবলী জাতীয় স্বার্থ বিশেষ করে জনস্বার্থের অনুকুল না হওয়ায় সাবেক অর্থমন্ী শাহ এএম এস কিবরিয়া বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এর ফাঁদে পা দিতে সম্মত হন নি। সেই সময়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের মাত্র দুটি দেশকে কর্মসুচীর আওতায় নিতে না পারাটা ছিলো বহুজাতিক এই সংস্থা দুটির জন্য বড় ধরনের ব্যর্থতা। সে জন্য তারা চাপের মুখেও ছিলো । ফলে বিগত সরকারের উপর বিশ্ব্যাংকের অসন্োষ যেমন ছিলো, রাগও তেমন ছিলো কম না। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সাইফুর রহমান অর্থমন্ী হিসেবে দায়িত্ব নেওযার পর পরই বিশ্বব্যাংকের তৈরি করে দেওয়া খসড়া অনুসারে তার নীতি নির্ধারনী বক্তব্য দিতে শুর" করেন। সাইফুর রহমানের 'সাহসী' বক্তব্য সেই সময়ে মিডিয়াতেও ব্যাপক প্রচার পায়। তবে অল্প দিনেই সবাই বুঝে যায়, সাইফুর আসলে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এর ফাঁদে পড়ার ক্ষেত্র তৈরি করছেন মাত্র। এই সরকার আবার বাংলাদেশে বিশ্ব্যাংকের সকল কার্যক্রমকে কোন ধরনের আইনি বিচার প্রক্রিয়া থেকে রেহাই দিয়ে দায় মুক্তি আইন পাশ করেছে। ফলে সাইফুর রহমান এবং বিএনপি সরকারের প্রতি বিশ্ব্যাংকের এক ধরনে কৃতজ্ঞতা থাকারই কথা। কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেই হয় তো বা বিশ্বব্যাংক ওয়াশিংটন বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছে।

মার্কিন সরকারও যে বাংলাদেশে জঙ্গী তৎপরতা নিয়ে খুব একটা উদ্বিগ্ন,তা আমার খুব একটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। বাংলাদেশ একটি 'মডারেট মুসলিম দেশ' এই সাইনবোর্ডের আড়ালে বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গীবাদ বিকাশে সরকারি পৃষ্টপোষকতাকেও তারা ইতিবাচক হিসেবেই নিয়েছে। অবশ্য শাহ এ এমএস কিবরিয়ার মতো একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের নির্মম হত্যাকান্ডের পর যুক্তরাষ্ট্র খানিকটা নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হচ্ছে বলে ধারনা করছেন অনেকে।তবে এ ব্যাপারেও নানা প্রশ্ন উঠছে।

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা নেওয়ার পর প্রেসিডেন্ট বুশ তার নীতি নির্ধারনী বক্তব্যে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রনের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন। ধর্ম ভিত্তিক সুবিধাবাদী রাজনীতি এখন বুশেরও নীতি। তা ছাড়া বাংলাদেশে মার্কিনীদের স্বার্থ আছে। তেল গ্যাস, চট্টগ্রাম বন্দর ইত্যাদি অনেক অমিমাংসিত বিষয় নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাদের দেনদরবার চলছে। আওয়ামীলীগের শাসনামলেও যুক্তরাষ্ট্র এই সব নিয়ে দেন দরবার করেছে। কিন্তু আওয়ামীলীগের অবস্থানে দেশের স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ায় মার্কিনীরা হতাশ হয়। বিএনপি সরকারের আমলে তারা এই সব বিষয়ে যথেষ্ট 'আরাম' (কমফোর্ট) বোধ করছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। তা ছাড়া বিশ্বের দেশে দেশে মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশের ভেতরে অস্থিতিশীলতা তৈরি করেই যুক্তরাষ্ট্র ওই সব দেশে হস্তক্ষেপের পরিবেশ তৈরি করেছে। ঢাকায় বিশেষ কোনো স্বার্থ আছে বলেই তো ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদুত বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে ছুটাছুটি করে নানা রকম উপদেশ বাণী বিতরনে সময় কাটাতে পারছেন।

যাই হোক, বিশ্বব্যাংক এর কৃতজ্ঞতাবোধ এবং মার্কিনীদের গোপন কোনো স্বার্থবোধ ওয়াশিংটনে পশ্চিমা কুটনীতিকদের বাংলাদেশের ব্যাপারে কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত রাখলেও সরকার তাতে বিব্রত হয়েছে বই কি! কিন্তু ক্ষমতায় যারা থাকে তারা তো কখনোই বিব্রত হয় না, তাদের হতে হয় ক্ষুব্ধ। বিএনপিও তাই ক্ষুব্ধ হয়েছে। সেই ক্ষোভের প্রধান লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছে মিডিয়া।

বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমুর্তি উন্নত করার দায়িত্ব মুলত সরকারের । কিন্তু বিএনপি সরকার বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমুর্তিকে মস্তবড় এক প্রশ্নবোধক চিহ্নের মুখোমুখি দাড় করিয়ে দিয়েছে। ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের কাছে বাংলাদেশ শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ, আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশে একটি মৌলবাদী জঙ্গী দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে দেশটির শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারনে জনগন নিরপত্তাহীন, তারা চিহ্নিত করেছেন দেশটির শাসনতন্ত অকার্যকর হিসেবে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বলা হচ্ছে 'বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র' । এসবের দায়দায়িত্ব কোনো ভাবেই ক্ষমতায় থাকা সরকার এড়াতে পারে না।

সাবেক স্বৈরাচারী শাসক এরশাদের একটি প্রিয় উক্তি ছিলো,' আমার হাতে রক্তের দাগ নেই।' পঁচাত্তর পরবর্তী রাজনীতিতে এবং ক্ষমতার সদরে-অন্দরে রক্তাক্ত পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই

কথাটির জন্ম হয়েছিলো। এরশাদের মতে, তিনি কারো রক্তে হাত রঞ্জিত করে ক্ষমতা দখল করেননি। তিনি এই কথাটি বার বার বলতেন। পরে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রাখতে তিনি এতোটাই রক্ত ঝরিয়েছেন যে, তাতে কেবল তার হাতই নয়, তিনি নিজেই রক্তপিপাসু এক কাপালিক হিসেবে আবির্ভুত হয়েছিলেন। গণ-অভ্যুত্থানে এরশাদের পতন এবং দেশে গণতান্ত্রিক চর্চা শুর" হওয়ার পর রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে এই বাক্যটি বিদায় নেয়। কিন্তু বেগম জিয়ার শাসনামলের এই পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগনের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসার পর তিনি কেন 'তাঁর হাতকে রক্তে রঞ্জিত করার' অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন। বিএনপি সরকারে হানিমুন শুর" হয়েছিলো সারা দেশে সংখ্যালঘুদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন দিয়ে, সংখ্যালঘুদের রক্ত আর ইজ্জত নিয়ে হোলি খেলায়। তারপর তো পরিস্থিতির অবনতিই হয়েছে কেবল। তাহলে মিডিয়ায় এই সব ঘটনা প্রচার পেলে, উন্নয়ন সহযোগীরা পরিস্থিতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে গণতন্ত্র বিপন্ন হওয়ার প্রশ্ন ওঠে কেন?

দাতারা বাংলাদেশকে সহায়তা দেয় তাদের নিজ দেশের জনগনের ট্যাক্সের পয়সা থেকে। তাদের ব্যয় করা প্রতিটি পয়সার জন্যই তাদের দেশের জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা আছে বলেই তাদের এই জবাবদিহিতা। কিন্তু খালেদা জিয়া বা সাইফুর রহমান সাহেবরা যে জনগণের পয়সায় সরকার পরিচালনা করেন, সেই জনগণের জানমালের নিরপত্তা দিতে ব্যর্থ হলেও তারা লজ্জিত হন না। চক্ষুলজ্জার খাতিরে জবাবদিহিতারও প্রয়োজন বোধ করেন না। উন্নয়ন সহযোগীরা যখন জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নিরাপত্তাহীনতার দিকে অঙ্গুলি তুলে সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চান, তখনি সরকারের দেশপ্রেম উথলে উঠে। তখনি তাদের মনে হয় দেশের গণতন্ত্র,সার্বভৌমত্ব বিপন্ন।

মানতেই তো হবে, ইউরোপীয় দেশগুলো জনমানুষের মৌলিক অধিকার, দেশে আইনের শাসনের ব্যাপারে অধিকমাত্রায় আগ্রহী। তারা দেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাও দেখতে চায়। আর এও তো সত্য, ক্ষমতা গ্রহনের পর বিএনপি দাতাদের এই সব কথাবার্তা মানবে বলে বার বার প্রতিশ্র"তি দিয়েছে।প্যারিসে দাতাদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য ভিডিওতে ধারণ করে প্রচার করা হয়েছিলো। ওই বৈঠকে বেগম খালেদা জিয়া আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন তথা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তার রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কথা জানিয়ে তা বাস্বায়নে দাতাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। এক বছর পর ঢাকায় দাতাদের বার্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নিজে উপস্থিত থেকে এইকই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। আজ দাতারা যখন সেই সব প্রতিশ্র"তি, আশ্বাস বাস্ বায়িত না হওয়ার কথা সরকারকে মনে করিয়ে দি"ছ, তখনই বেগম খালেদা জিয়ার মনে হ"ছ- 'বাংলাদেশ কারো ডিক্টেটশনে চলবে না।' কিংবা অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান যখন দাতাদের প্রশংসা

সুচক সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য ম্যারাথন দৌড়াতে থাকেন, একটু আধটু প্রশংসা পেলে তা ঢালাও করে প্রচারের ব্যবস্থা করেন, সেই দাতাদের এক আধটু সমালোচনায়ই এতোটা তেতে ওঠেন। সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া যেখানে তার বাজেট বক্তৃতায় অর্থনীতিবিদদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করতেন, ব্যবহার করতেন রবীন্দ্রনাথের কথা, সাইফুর রহমান তার প্রতিটি বাজেট বক্তৃতার প্যারায় প্যারায় বিশ্বাংক আইএমএফ তার সরকার সম্পর্কে ইতিবাচক কি মন্ব্য করেছেন তা ব্যবহার করতে করতে বাজেট বক্তৃতাকে দাতাদের সার্টিফিকেট নির্ভর বানিয়ে ফেলেছেন। তখন তো তাদের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রশ্ন উঠে নি।

দাতাদের কথায় দেশের বৃহত্তম পাটকল আদমজী বন্ধ করে দিলে, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক বিক্রি করে দিলে গণতন্ত্র বিপন্ন হয় না, সরকারের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয় না। কেবল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার তাগিদ দিলেই সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয়,গণতন্ত্র বিপন্ন হয়!

সত্যিই বিচিত্র এই বাংলাদেশের রাজনীতি। যতোক্ষন সবকিছু পক্ষে যাবে ততক্ষন প্রেমের কোনো ঘাটতি হয় না। কিন্তু বিপক্ষে গেলেই হয়ে যায় দেশের শত্র“,জনগনের শত্র“। সত্যিকার অর্থে কে যে দেশ আর জনগনকে ভালোবাসে তা বোঝা বড়ই কঠিন।

শওগাত আলী সাগরঃ সাংবাদিক ও কলামলেখক